

Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আখ্যানতত্ত্বের আলোকে কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাস

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুপ্রিয়া রানী দাস
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.7
Pages	১২১-১৪২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আখ্যানতত্ত্বের আলোকে *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাস

Check for updates

সুপ্রিয়া রানী দাস*

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পূর্বরূপ আমরা পাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীতে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে বলাই হয় ঔপন্যাসিকদের পূর্বসূরি। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের পাশাপাশি লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারার প্রকাশক এই ধরনের সাহিত্যকর্মগুলো। কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রায়ণ ও আঙ্গিক কাঠামো পর্যালোচনা করে এই সাহিত্যকর্মগুলোকে বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক-প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করা অমূলক হবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সূচনা হয় সার্থক বাংলা উপন্যাসের। রচনারীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিম আশ্রয় করেছিলেন ইউরোপীয় শিল্পাঙ্গিককে, পাশ্চাত্যের সাহিত্যের বিভিন্ন ফর্ম যেমন — ট্র্যাজেডি, রোমান্স প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর রচনায়। এই ধারা চলেছিল বেশ কয়েক দশক। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেন চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে, শরৎচন্দ্র চরিত্রকে ঘিরে কাহিনি বয়ন করেন। অপরাপর লেখকদের মধ্যেও লক্ষ করা যায় যে, একটা প্লটকে স্থির করে তাঁরা উপন্যাস লিখেছেন। ১৯৩০-৪০-এর পর থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দৃষ্ট হয় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ইউরোপীয় ধারা থেকে ক্রমশ দেশজ ধারায় ফিরে আসার প্রবণতা লক্ষণীয় সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস*-এ এসে। এখানে লেখক প্লটকে ভেঙে দিয়ে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে কথকতাধর্মী রীতিতে কাহিনি বিন্যস্ত করেছেন। এই রীতির উপন্যাসকেই আপাতভাবে আখ্যান হিসেবে ধরা হয়। শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসটিতে এই দেশজ ধারার আখ্যান-প্রবণতা অন্বেষণই আমাদের লক্ষ্য।

১.১

আখ্যান বলতে কাকে বুঝব আমরা? অথবা কোন ধরনের রচনাকে আখ্যানধর্মী বলা হবে? আখ্যানতত্ত্বই বা কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা? কোনো রচনাকে আখ্যানতত্ত্বের আলোকে যাচাইয়ের আগে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান প্রয়োজন। বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে আখ্যানতত্ত্বকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মূলত উপন্যাসের নতুন ফর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আখ্যানতত্ত্বের উদ্ভব। রাশিয়ান আখ্যানতত্ত্ববিদ মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) বিশ শতকের তিরিশের দশকে উপন্যাস নিয়ে তাঁর যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, প্রায় তিন দশক পর সেই তত্ত্ব নিয়ে ইউরোপের সাহিত্যজগতে বর্ণনামূলক আখ্যানভাবনার ক্ষেত্রে যুগান্তর সাধিত হয়। (দ্র. রফিকউল্লাহ, ২০১১ : ২৪)

> বাখতিন বলেন, ফর্মের কাঠামোকে অস্বীকারের প্রয়োজন থেকেই উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। লিরিক, এপিক বা নাটকের জন্যে বহুকালের অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়ে ওঠা তত্ত্বের কাঠামোতে ফেলে উপন্যাসের স্বরূপ চেনা যায় না — এ-কথা বলেই বাখতিন তাঁর বক্তব্য আরো বিস্তারিত করেন — কোনো এক ভাষার সাহিত্যে, যখনই সেই সাহিত্যের

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> সীমা, সেই সাহিত্যের ওপর আরোপিত বাধানিষেধ, অতিক্রমণের প্রয়োজন দেখা যায় তখনই উপন্যাস সৃষ্টি হয়। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫১)

বাখতিন 'নভেলাইজেশন'-এর লক্ষণগুলোকে এভাবে দেখাতে চেয়েছেন যে, নভেল কথাসাহিত্যের অন্যান্য ধারার চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন ও নমনীয় গঠনের, তার ভাষা প্রতি মুহূর্তে নতুনত্ব পাচ্ছে। (অমিতাভ, ২০১০ : ২০)

অমিতাভ দাস এ বিষয়ে আরো বলেছেন : "মূলত ভাষার সংগঠন নিয়ে আলোচনার সূত্রে এর (আখ্যান তত্ত্ব/Narratology) জন্ম। যদিও কখনো প্রয়োগবাদী দর্শন, কখনো চিহ্নবিজ্ঞান, কখনো নৃতত্ত্ব কিংবা লোকসংস্কৃতি — এবংবিধ বিদ্যার মিলিত ভূমিকায় এর তত্ত্বকাঠামোটি গড়ে উঠেছে।" (অমিতাভ, ২০১০ : ৩)। তাই বলা যায় আখ্যান অনেক বেশি জনমানুষ-সংলগ্ন। আখ্যানতত্ত্ব মূলত জনমানুষের জীবনকথাকেই বিশ্লেষণ করে। আর "আখ্যানতত্ত্ব দিয়ে সমাজ ও মানবমনের নানা সমাবেশ ও চেনাজানাকে নতুন করে বোঝা সম্ভব, তেমনি সেগুলো মূল্যায়নের নিরিখও গড়ে তোলা সহজ।" (আকতার কামাল, ২০১০ : ১২)

১.২

কোনো কোনো তাত্ত্বিক আখ্যানতত্ত্বের পরিধির মধ্যে প্লটের ধারণাকে জায়গা দিতে নারাজ। "সংগঠনবাদী যুক্তিতে, আখ্যানতত্ত্ব, অ্যারিস্টটলীয় প্লটের ধারণাকে প্রশ্রয় দেয় না; এই প্রত্যাখ্যান মুখ্যত অবয়ব সংস্থানের নীতিগত যুক্তিতে, এবং অংশত এর পূর্বানুমানযোগ্য চরিত্রের কারণে।" (অমিতাভ, ২০১০ : ২৭)। তবে আখ্যানেরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে যা একে স্বকীয়তা দেয় — "আখ্যান যেহেতু story with a storyteller, তাই আখ্যানে নিশ্চিতভাবে থাকে দুটি কাল বা সময়। একটি স্টোরি টাইম বা কাহিনী কাল এবং দ্বিতীয়টি সেই কাহিনী কথনের সময় বা কথনকাল।" (অমিতাভ, ২০১০ : ২৮) অর্থাৎ আখ্যানে অনুপ্রবেশ ঘটে দুটি সময়ের, অর্থাৎ ঘটনাকাল ও রচনাকাল এই দুটোর মিথস্ক্রিয়া বা interaction-ই নিয়ন্ত্রণ করে আখ্যানকে।

১.৩

আখ্যানের আঙ্গিকধর্মিতা বিষয়ে সমালোচকদের মত প্রণিধানযোগ্য—

> বেশিরভাগ আখ্যানের কথন হল সর্বজ্ঞ রীতির, যা ঐতিহাসিক প্রোটোটাইপ হিসেবেই গণনীয়। (অমিতাভ, ২০১০ : ২৯)

আবার,

> কখনো কখনো কথক, তার আখ্যানকথনে অন্য কোনো ভূমিকার দৃষ্টিকোণও ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ সেই ভূমিকা যখন সমগ্রত অথবা অংশত কোনো কাহিনীর দ্রষ্টা, ফোকালাইজার বা নিরীক্ষক, তখন সেই ভূমিকার সংলাপ — উপাদানকে কথক তার পরোক্ষ বাচনের মধ্যে রোপিত করতে পারে। (অমিতাভ, ২০১০ : ৩১)

আখ্যানের বিষয় বা কনটেন্ট উপাদান হিসেবে ধরা হয় নিচেরগুলোকে —

— কাল বা সময়
— ভূমিকা/ভূমিকা-চরিত্র/চরিত্র
— সংস্থান
— কাহিনী (অমিতাভ, ২০১০ : ৩২)

আখ্যানতত্ত্বে চরিত্রায়ণকে প্রধানত তার গঠনগত মূল্যেই গ্রহণ করা হয়।

> আখ্যানতাত্ত্বিকেরা 'এক্সপ্রেশন' বা প্রকাশস্তরের বাইরে, ভূমিকার কোনো মনস্তত্ত্বায়ন স্বীকার করেন না; কেননা 'চরিত্র' হল কোনো আখ্যানের ঘটনা-আশ্রয়ী এক ধরনের 'রোল', যাকে আরও নির্দিষ্ট অর্থে ভূমিকামাত্র বলা চলে। ফলত সেই ভূমিকা-নির্মাণ আখ্যান প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। (অমিতাভ, ২০১০ : ২৯)

আবার

> আখ্যানের ঘটনাক্রম বা সময়ের বিন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বশাসিত। 'প্রকৃত' সময়ের সঙ্গে ধারণাগত সাদৃশ্য অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ — এই কালানুক্রম আখ্যানের সময়েও দেখা যায়, কিন্তু গঠনগত দিক থেকে আখ্যানের সময়, 'প্রকৃত' সময়ের থেকে একেবারেই আলাদা চরিত্রের। (অমিতাভ, ২০১০ : ৩৪)

"আখ্যানের সময় — অবধারিতভাবে অতীতকালের বা নিত্যবৃত্ত কালের। কেননা, কথনকালের তরফে কাহিনীর কাল যদি বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ-ও হয়, তবু পাঠকের কাছে কথন হল, ঘটে যাওয়া কাহিনীর আখ্যান-বিবরণ মাত্র। ...আখ্যানের ব্যাপ্তিকাল তাই অবধারিতভাবেই 'অতীত' কাল" (অমিতাভ, ২০১০ : ৩৫-৩৬)

আখ্যানে অনেক সময় অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বিভাজনে শিরোনাম ব্যবহৃত হয়। শিরোনামগুলো পর পর সাজালে উপন্যাসের থিমগত ক্রমের একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। আর "আখ্যানের মুখ্য ও গৌণ চরিত্র নির্ধারণে পৌনপুনিকতার ভূমিকা গঠনগত। সাধারণত সবচেয়ে বেশি পৌনপুনিক চরিত্রগুলি আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে"। (অমিতাভ, ২০১০ : ৪৮)

২.১

কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাসে প্রধানত কয়েকটি বিষয়কে প্রধান ধরে লেখক অগ্রসর হয়েছেন।

প্রথমত, বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় ইতিহাস,

দ্বিতীয়ত, দেশভাগ, হিন্দুদের দেশত্যাগ, ওপার বাংলা থেকে মুসলমানদের এপারে আসা,

তৃতীয়ত, বিভাগোত্তর নতুন জীবনবেদ,

চতুর্থত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বোপরি

বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ইতিহাস বর্ণন।

লেখক কোনো নির্দিষ্ট প্লটের আশ্রয়ে নয়, বরং বিভিন্ন চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু, সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ, চেতনা-প্রবাহরীতির ব্যবহার প্রভৃতি নানা আঙ্গিকে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যস্ত করেছেন। স্মৃতি, উপকথা, গল্প, মেলার কথা, ধর্মীয় পুরাণ প্রভৃতির মাধ্যমে উপন্যাসে এসেছে অতীতের বিস্তৃত ইতিহাস। পাশাপাশি সমকালীন জীবনও অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন লেখক। ঔপন্যাসিক চরিত্রসমূহকে উপজীব্য করে বুনন করেছেন সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসের পালাবদলের এক অনবদ্য গাথা।

একই সঙ্গে এখানে আমরা লক্ষ করি inter-textual প্রভাব; হয়ত অবচেতনই তাড়িত করেছে ঔপন্যাসিককে। তাঁর আবদুল মাস্টার চরিত্রটি তারাশঙ্করের 'দেবু ঘোষ' বা শহীদুল্লা কায়সারের 'সেকান্দর মাস্টার' চরিত্রের প্রতিভূ যেন। অন্যদিকে, কদভানু-কানু যেন বিভূতিভূষণের অমর চরিত্র 'দুর্গা-অপু' প্রভাবিত।

২.২

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)-এর বৃহৎ কলেবরের উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৯৮)। এর খসড়া পাণ্ডুলিপির রচনাকাল, পরিমার্জন এবং পুনর্লিখন-এর সময়পরিসরও সুদীর্ঘ। ১৯৭২-এর জুন-জুলাইতে শুরু হয়ে ১৯৮৭-এর মার্চ-এপ্রিলে শেষ হয় এটি লেখার কাজ। (মতিন, ১৯৯৮ : ৩০) ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে বিধৃত করেছেন বিশেষত একটি জনপদের মানবেতিহাসের ক্রমধারা, যাতে যুক্ত হয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সমকালপ্রসারী রাজনৈতিক ইতিহাস, রূপায়িত হয়েছে প্রবাসী লেখকের নিজ জন্মভূমি, নিজ গ্রামের প্রতি অপরিসীম প্রেম ও অনুরাগ।

> বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বাংলাভাষী ভূখণ্ডের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে বহুমুখী সংকট দেখা দেয় — মানব অস্তিত্ব-সন্ধানী যে-কোনো সংবেদনশীল লেখকের জন্যই তা অত্যন্ত বেদনার কারণ হয়ে উঠতে বাধ্য। (রফিকউল্লাহ, ২০১১ : ২৫)

আর এ-সব বিষয়ই গভীর মমতা ও সহমর্মিতায় উপস্থাপিত হয়েছে *কাঞ্চনগ্রামে*।

২.৩

উপন্যাসের শুরুতেই শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম উপস্থাপন করেছেন তিনটি আলাদা উৎস থেকে সংগৃহীত উদ্ধৃতি। যথাক্রমে বোধিসত্ত্বদান কল্পলতা, প্রখ্যাত লেখক-দার্শনিক মার্সেল প্রুস্ত ও বার্ট্রান্ড রাসেলের উক্তি। পৃথিবীর পৌরাণিক ইতিহাস অনুসন্ধান, স্মৃতির মধ্যে বাস্তবতা অন্বেষণের কথা তোলার পর ব্যবহৃত হয়েছে বার্ট্রান্ড রাসেলের উচ্চারণ যার প্রথম বাক্য —

> I think action is best when it emerges from a profound apprehension of universe and human destiny, not from some wildly passionate impulse of romantic but disproportional self-assertion.

প্রকৃতপক্ষে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম প্রথমেই তাঁর রচনার বিষয় ও বর্ণন কৌশলের ইঙ্গিত দিয়েছেন এদের মাধ্যমে। সুপ্রাচীন অতীত রোমন্থন, বর্তমান অঙ্কন এবং ভবিষ্যৎপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলন তাঁর এই উপন্যাস। পাশাপাশি তিনি নজর দিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনার প্রতি। *কাঞ্চনগ্রাম* লেখার উদ্দেশ্য এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও চেতনা ব্যাখ্যা করে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম লেখেন :

> অনেক দিন ধরেই আমার জন্মভূমির মানুষের জীবন-সংগ্রামের ছোট-বড় কিছু কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা করেছি; ক্রমে ক্রমে মনে একটা গভীর প্রেরণা অনুভব করেছিলাম যে, একটা ব্যাপক জীবন-চেতনা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাকে উপস্থাপন হয়ত আরও সার্থক এবং কার্যকরী হবে। (মতিন, ১৯৯৮ : ৩০)

২.৪

কাঞ্চনগ্রাম-এ আমরা পাই নদীমাতৃক বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের টিকে থাকার অবিরাম সংগ্রামের চিত্র। মূলভাব বর্ণনের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক যেন বয়ান করে চলেছেন সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ক্রমধারার ইতিহাস। উপন্যাসটির আখ্যানধর্মিতা বিচারের প্রারম্ভে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন এই ধারার রচনার বিশেষত্ব সম্পর্কে —

> উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যসাহিত্য যে জঙ্গমতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করে, বর্তমানে তার চরিত্র সম্পূর্ণতই ভিন্নমাত্রিক। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পশ্চিম-উত্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বব্যাপী বাঙালি অধ্যুষিত করিমগঞ্জ, কাছার ও শিলচর। এর বাইরেও বাঙালির ভারতবর্ষ ও বিশ্বব্যাপ্ত অবস্থানের কথা সর্বজনবিদিত। এইসব ভূখণ্ডের নৃতাত্ত্বিক আঞ্চলিক রূপের মধ্যে মিশেছে রাজ্য ও কেন্দ্রের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও সাহিত্য দেশকালাতীত প্রকাশমাধ্যম, তবুও ভাষিক, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক চরিত্র সে অতিক্রম করতে পারে না। তা সম্ভবও নয়। বরং আঞ্চলিক চরিত্রই কোনো ভাষার সাহিত্যকে করে তোলে স্বতন্ত্র, বৈচিত্র্যময় ও মাত্রাবহুল। বাংলা গদ্য আখ্যান বা উপন্যাসের বিগত সার্ধ শতাব্দীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া দেশবিভাগের ফলে অভিবাসী জনতার ব্যাপক স্থানান্তর বাংলাভাষী অঞ্চলের সামাজিক শৃঙ্খলায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয় সৃষ্টি করে, বাংলা আখ্যানসাহিত্যে তার প্রভাবও প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। (রফিকউল্লাহ, ২০১১ : ৩০-৩১)

এই প্রভাবেরই সার্থক প্রতিফলন লক্ষণীয় *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসে। গ্রাম ও শহরের রূপান্তর প্রক্রিয়া, শহরের গড়ে ওঠা, বিবর্ধন, ইতি ও নেতিবাচকতা, মানুষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং অন্তে দেশব্যাপী প্রকাণ্ড আলোড়ন মানুষগুলোর জীবনে কী প্রভাব ফেলে তারই গদ্য-ভাষ্য উপন্যাসটি —

> একটি সমাজের সৃষ্টিশীল মন কিভাবে যুগপৎ কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ দুই গতির টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়, তার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের উপন্যাসে দুর্লক্ষ নয়। তবে ভূগোল ও মৃত্তিকাচিহ্নিত ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনের শিল্পরূপ হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উপন্যাসের যাত্রা বিশ শতকের শুরুতেই সূচিত হয়েছে। যেখানে নিম্নবর্গ, গঠনমান ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং কৃষিনির্ভর মুসলিমজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। (রফিকউল্লাহ, ২০১১ : ৩১)

৩.

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম-এর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য — "শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম-এর গদ্য গীতময়, কিন্তু আবেগী ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ।" (আকরম, ২০১০ : ১২০) তাঁর রচনার প্রধান গুণ তীব্র ভাবাবেগ। গ্রামীণ জীবনের সুদক্ষ বিন্যাসকার শামসুদদীন আবুল কালাম-এর ব্যতিক্রমী রচনাও বটে *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসটি। এ উপন্যাসের বিষয় ও জীবন-আলোচনার প্যাটার্নটিও ভিন্ন। এখানে তিনি প্রবেশ করেছেন সমাজবাস্তবের গভীরতায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকের মতবাদ চরিত্রের ওপর অনেকটা আরোপিত বলে মনে হয়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জালাল মিঞা লেখকের সমাজ-মানসেরই মুখপাত্র।

কাঞ্চনগ্রাম-এর বিষয়, জীবনার্থ ও সময়-পরিসর বিপুলায়তনে ব্যাপ্ত। এখানে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন ধর্মের পুরাণ কাহিনি, মিথ, লোকায়ত গাল-গল্প। চিরায়ত ধর্মভীরু ও হুজুগে বাঙালি জাতির জীবনাচরণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি লেখক উপস্থাপন করেছেন অনমনীয় তরুণ সমাজকে, যারা উৎসাহী হয়েছে পুনর্নির্মাণে। দেশের কল্যাণ-কামনা থেকে তারা নিজেরা সংগঠিত হয়েছে, উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছে অন্যদের। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বছর ধরে লিখিত ও পরিমার্জিত হয়েছে উপন্যাসটি। ঔপন্যাসিকের অনেক স্বপ্ন ও সাধনার ফসল *কাঞ্চনগ্রাম*। প্রবাসে থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ে কার্যকর অবদান রেখেছেন এই গুণী ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে এখানেই স্থায়ী হতে চাইলেও নিয়তি তা হতে দেয়নি। আমৃত্যু তিনি অনুভব করেছেন দেশকে, দেশের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতিকে। দেশের প্রতি আপামর জনতার অনুভূতির তীব্রতা প্রত্যক্ষ করেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরের বছর *কাঞ্চনগ্রাম* রচনা শুরু করেন। লেখকের নিজের ভাষায় —

> এর বিষয়বস্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধ; সমস্ত ভুবনের প্রেক্ষাপটে এক দেশীয় সত্তা অনুভব এবং রূপায়ণের জন্য এ গ্রন্থ লিখতে বসেছিলাম; প্রথমে ইংরেজিতে এবং পরে বাংলায় লিখি; বাংলায় লেখা এক ক্ষুদ্র সংস্করণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কোনও এক কাগজে পাঠানোও হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয়নি; অবস্থা পরিবর্তনে এখন তা আর মুদ্রণযোগ্যও নয়; এটি অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র প্রস্তুতের জন্য তখনকার তথ্য ও বেতার বিভাগীয় মন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতও করেছিলাম সাহায্যের আশায়। এখন আর সেই চিত্রনাট্যেরও আর কোনও মূল্য নেই। কিন্তু এই *কাঞ্চনগ্রাম* তারই পরিণতি, সংস্কৃত এবং বিবর্তিত রূপ। (মতিন, ১৯৯৮ : ১৪৮)

বলাই বাহুল্য যে, ঔপন্যাসিক তাঁর জীবদ্দশায় উপন্যাসটিকে গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি।

৪.১

বরিশালের সন্তান শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম দক্ষিণবঙ্গের জীবনকেই রূপায়িত করেছেন এখানে। সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এর ভাষা, নদী-কেন্দ্রিক জীবন ও কৃষি আমাদেরকে

দক্ষিণবঙ্গের জীবনাচারকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নদী এখানে ব্যবহৃত হয়েছে জীবনপ্রবাহের প্রতীক হিসেবে —

> এইখানের এই বিশাল বহতা নদী যেন বিরাট বিপুলা জীবনেরই গতিময়তার প্রতীক, তাহার ভাটা-জোয়ারের টানাপোড়েনের ছন্দও যেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্মেরও অংশ। বিস্তৃত স্রোতের গতিধারা যে-ছন্দে ছোট ছোট ঢেউ হইয়া চপলমতি শিশুদের মত তীরের মাটিতে হাত বুলাইয়া ক্রীড়াকৌতুকে ভাঙিয়া পড়ে, তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া এই নদীর অভ্যন্তরের এবং দুই তীরবর্তী জীবনও যেন একই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৯)

কাঞ্চনগ্রাম নিভৃত পল্লি, যেখানে মানুষগুলোর নিস্তরঙ্গ জীবনে মুক্তিযুদ্ধ তরঙ্গ জাগায়। বাংলার এই গ্রামের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন আবেগী হয়ে —

> যেমন বাবুই পাখীর বাসা দোলে কোনও কোনও গাছের ডালে অনেকগুলি একই ধারে, যেন সেই মতই গড়িয়া উঠিয়াছিল এক পাশের *কাঞ্চনগ্রাম*, মূল সড়কের একধারে বিল আর অন্যদিকে নদীকে ঠেকাইয়া। গ্রাম হইতে সড়কটাকে যেমন আন্দাজ করা যায় না আবার সড়কের দিক হইতেও তার অবস্থান আকৃতি নির্ণয়ও কঠিন। পুঞ্জ পুঞ্জ বাড়িঘর যেন মুখ থুবড়াইয়া রহিয়াছে জলাভূমির মধ্যে, এক হইতে অন্যে বিচ্ছিন্ন। নানারকম গাছ-গাছালির আড়ালে-আবডালে কেবল কোথাও কোনও ধোঁয়া অথবা কাক-পাখী দেখিয়া কি কলরব শুনিয়াই আন্দাজ করা যায়, কোনখানে বসতি আছে অথবা কি ঘটিতেছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৮০)

একটি জনপদের জীবনই মূলত ব্যাখ্যাত হয়েছে আলোচ্য রচনায়।

৪.২

ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন কীভাবে বদলে যাচ্ছে সমাজ, মানুষের মনস্তত্ত্ব, নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনও কীভাবে আলোড়িত হচ্ছে সমকালীন ঘটনার প্রভাবে, আবহমান কাল থেকে সমকাল পর্যন্ত মানুষের পেশা-ধর্ম পরিবর্তন, ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কীভাবে বদলে দিচ্ছে গ্রামের সাধারণ জীবনকে। তিনি এখানে অবতারণা ঘটিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ভাষার সাহিত্যের, উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ও উপকথার। এর মাধ্যমে তিনি জোর দিয়েছেন আন্তঃধর্মীয় সৌহার্দ্য ও নিশ্চিতভাবেই আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির প্রতি। বর্ণনা করেছেন অবিভক্ত ভারত ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রসঙ্গ এনেছেন বিশ্বযুদ্ধেরও। এছাড়া কৃষিকাজের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে তার স্বাভাবিকতা ও ব্যবহারিক প্রাত্যহিকতা নিয়ে। গাছপালা ঘেরা, নদীমাতৃক গ্রামবাংলার অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন লেখক। তবে উপন্যাসের অন্যতম ব্যতিক্রমী ঘটনা হল — লোকলজ্জার ভয় না করে পারিবারিক জীবনে নিঃসঙ্গ জালাল মিঞার বাড়িতে পুত্র-কন্যাসহ রূপার আশ্রয় গ্রহণ। তাদের মধ্যকার সুস্থ সম্পর্ক, জালাল মিঞার জীবনের সঙ্গে এই মানুষগুলোর জড়িয়ে যাওয়া — বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেই একটি অনন্যপূর্ব ব্যাপার। নারী এখানে এসেছে সুস্পষ্টভাবে, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেসহ। রূপা অথবা চম্পা অথবা আয়েশা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সবশেষে বিশাল আলোড়ন ও প্রভাব নিয়ে মানুষগুলোর জীবনে নিয়তির মতো নেমে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ।

৫.১

কাঞ্চনগ্রাম -এর পটভূমি সম্পূর্ণভাবেই *কাঞ্চনগ্রাম* নামক গ্রামকে ঘিরে বিস্তৃত। সুপ্রাচীন কাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এই গ্রামেরই ক্রমবিবর্তনের আখ্যান উপন্যাসটি। সামান্য পরিমাণে শহরের প্রসঙ্গ বিবৃত হলেও ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ গ্রামটিরই প্রতি। 'মাঙ্গলিক' অংশে লেখক ইঙ্গিত করেছেন মহাকালের চিরায়ত গতিধারার প্রতি। এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে, আর এভাবেই এগিয়ে চলে মানব-সভ্যতা। লেখকের জীবনবীক্ষা, মানসপ্রবণতা আর সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক মননের বিবরণ নিয়ে 'উপক্রমণিকা' অংশটি যেন উপন্যাসের মূলভাব প্রকাশক। এরপর কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে যথাক্রমে— 'অবতরণিকা', 'প্রথমা অন্তরা', 'দ্বিতীয়া অন্তরা', 'বিস্তারণা', 'স্বতঃশিলা', 'অববাহিকা', 'অন্তর্লীনা', 'ক্রমান্তরা', 'স্বয়ংবরা', 'মাধ্যমিকা', 'ধারা-উপধারা', 'উপলব্যথিতা', 'নিশিথ গম্ভীরা', 'গোপনাভিসার', 'পরম্পরা', 'দিক পরিক্রমা', 'অন্তঃসলিলা', 'জীবনবন্যা', 'কূল-উপকূল', 'তরঙ্গরঙ্গ', 'বায়-বাতাস', 'উদারা', 'বেপথু ব্যাকুলা' ও 'উপসংহার' অংশে। শেষে যুক্ত হয়েছে 'পরিশিষ্ট', যেখানে ঔপন্যাসিক শত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশকে নিয়ে সুতীব্র আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। শামসুদদীন আবুল কালাম *কাঞ্চনগ্রামে* উন্মোচন করেছেন সমকালীন বাস্তব সমাজ ইতিহাসকে। উপন্যাসটির সময় মোটামুটিভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছু পূর্ব থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত।[১] ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর এই সময়টাতে পূর্ববঙ্গের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। তার অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। মুসলমান প্রধান পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে এর অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই পর্যায়ে ম্লান হতে শুরু করেছে। সুবিধাবাদীরা নিজেদের আখের গুটিয়ে নিয়েছে এবং নিচ্ছে। দেশের লক্ষ্মী যেন পূর্বের বাবুদের সঙ্গে দেশান্তরী হয়েছেন "মালিক বাবুরা দেশের ভগবানরে শুধ্-ধা লইয়া গেছে"। মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত। একটি মাত্র পেশায় থেকে জীবিকা চালানো যাচ্ছে না। গ্রামের মসজিদের ইমাম মকবুলের অবস্থান স্পষ্ট এই উদ্ধৃতিতে —

> ...খাদেম মকবুল দুই-চারটা তত্ত্বকথা বলা দূরে থাকুক, সে যেন মসজিদকে একটা দোকানঘর বানাইতেই ব্যস্ত। কোথায় কোন শহর হইতে বান্ডিল বান্ডিল কী সব আনিয়া সে কেবল কাঞ্চনগ্রাম কেন, তাহারও আশেপাশে গাঁয়ে-গঞ্জে গাহেক খুঁজিয়া বেড়ায়। (শামসুদ্দীন ২০০০ : ২৫)

এর পেছনে কারণ হিসেবে জালাল মিয়া দাঁড় করিয়েছে গ্রামের মানুষের দলে দলে গ্রাম এবং দেশ ত্যাগ করে যাওয়াকে। বর্ণ-হিন্দুরা ধীরে ধীরে গ্রাম ত্যাগ করেছে, মুসলমানরা উদ্যোগী হয়েছে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে। সব মুসলমান না হলেও অনেকে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দু যেমন, ডোম-ঋষি নিজেদের পেশা-ধর্ম-দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে ব্যাপকহারে। কামার-কুমার-সুতার-মিস্ত্রীরাও ক্রমশ পেশা ও দেশ বদল করেছে। পেশা বদলের আর একটা কারণ হল সেকালে পালা-পার্বণ হত ধনী হিন্দুদের বাড়িতে, সেখানে প্রয়োজন হত নানা জিনিসের। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেসব জিনিসের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তাই হেদায়েতউল্লাহকেও বংশানুক্রমিক ঢোল বানানো ও

বাজানোর পেশা ছাড়তে হয়েছে। এই কারণেই এই মানুষগুলো জীবনে সুস্থির হতে পারেনি। ফল হয়েছে এই—

> একমাত্র বহতা রহিয়াছে ঐ নদী। মানুষের বেশ এবং পেশা বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশও বদলাইয়াছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৩৮)

তার ফলে গ্রাম বিরান হয়ে পড়েছে, ধর্মে-কর্মেও মানুষের মন নেই। জালাল মিয়ার আশঙ্কা—

> এই গ্রামটাও ঐ সোনারগাঁওয়ের মতই এক্কেবারেই বিরান হইয়া না যায়। (শামসুদদীন, ২০০০ : ২৬)

বাড়িঘরের চারিত্রও বদলে গেছে অনেকাংশে—

> এখনকার ঐ শহরের মানুষ আউশ-আমনের তফাতটাও জানে না। ...এক গাঁয়ে একজনার কাটা-জখমে গাঁদা-ফুলের রস দেওনের জন্য একটা গাছও কোথাও পাওয়া গেল না। পাইবে কোথায়, যারা তার মর্ম বুঝতো তারা যত্ন করিয়া লাগাইতো, এখন যারা দখলীস্বত্বে আছে, তারা বেবাক সব কাটিয়া সাফ করিয়া ফেলাইছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ২৮)

এমনকি সমাজে ধর্মের খাতিরে বাহ্যিক বেশ পরিবর্তনের একটা হাওয়া লেগেছে। হয়ত বা নতুন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র মানুষকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। তাই মকবুল খাদেম বলে "মোচ কামাইয়া দাড়ি রাখলে মঙ্গল হইবে।"

মানুষ সুযোগ-সুবিধার জন্য শহরমুখী বা প্রবাসী হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেকড়ের টান থেকেই যায়। আবদুল মাস্টারের উক্তিতে যে সত্য প্রকাশিত, প্রবাসী ঔপন্যাসিকের হৃদয়ের কথা সেটি —

> একটু-আধটু যা পড়ি-শুনি তাতে মনে কয় দুনিয়ার সবখানেই সক্কল মানুষ নানান লোভে শহর-বন্দরে গিয়া ভিড় করছে, কেননা সকল সুবিধার সূত্র যে সেইখানে। সেইটাই নিয়ম, সভ্যতা সেইভাবেই আউগাইছে। তবে ইতিমধ্যেই আবার নিজ মাটির টানে সক্কলের প্রাণ উচাটন হইয়া উঠতে শুরু করছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ২৯)

উপন্যাস সমাজের দর্পণ, সেখানে ধরা পড়ে সমাজের নানা বিচিত্র দিক। শামসুদদীন আবুল কালাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এনে দেখিয়েছেন কীভাবে যুদ্ধের বাজারে একদল মানুষ বিপুল বিত্তের মালিক হয়। শুধু তাই নয়, যে যেভাবে পারে লুট করতে চায়। যুদ্ধাক্রান্তদের সাহায্যের নাম করে তাদের টাকা পকেটে ভরে এক শ্রেণির মানুষ। মুরারীর মুখে বলিয়েছেন নীল চাষ দ্বারা এদেশের গরিবের রক্ত শোষণের কথা।

৫.২

ঔপন্যাসিক *কাঞ্চনগ্রামে* শুধু পূর্ব বাংলার নয়, বরং সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মূর্ত করেছেন। দেশভাগ, এর কার্যকারণ, নেতাদের স্বার্থের সংঘাত, ধর্মভিত্তিক-অযৌক্তিক দেশবণ্টন, কতিপয় নেতা কর্তৃক জনগণের হিতসাধনের ব্যর্থ চেষ্টা

প্রভৃতি — ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে উপস্থাপন করেছেন লেখক। উপন্যাসটিকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক দলিলও বলা যায় এদিক থেকে।

নেতাদের কর্মযজ্ঞ আসলে নিভৃত পল্লির আপামর জনমানুষকে তেমনভাবে আলোড়িত করেনি, বা টালমাটাল রাজনীতির ঘটনাধারার প্রকৃত কারণ তারা সঠিক জানতেও পারেনি—

> এমন বিরাট পুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর প্রচেষ্টাও তাহাদের নিকট গৃহীত হইল না ; দূর বড় শহরে চট্টরাজ বাড়ির কন্যা সরোজিনীকেও পিতা অঘোরনাথের সঙ্গে সহ্য করিতে হইল অপমান-উপহাস। ...চট্টরাজ বাড়ির অঘোরনাথ ও তার কন্যা সরোজিনী কতটা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত জিন্নার সঙ্গে অথবা কোন দূর দেশের নবাবের কি নিজামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিশেষ জ্ঞান বা বিবরণ জালাল মিয়ার অবগতিতে নাই, কি কারণে বর্জিত হইয়া গেল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগ, সরোজিনী শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল গান্ধীর, একদিকে স্বরাজ অন্যদিকে স্বাধীনতার দাবিতে টালমাটাল হইয়া উঠিল সারা দেশ, সেই সব ব্যাখ্যা কোনদিন জালাল মিঞার বোধগম্য হয় নাই; কি কারণে বাঘা পুরুষ দেশবরেণ্য ফজলুল হকের গলায় পরান হইল জুতার মালা এবং এখনও একদল বিপুল মানুষ-গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি রুষিয়া-ফুঁসিয়া সারা হইতেছে নিজ সহস্র বন্ধনের মধ্যে, তাহারও কোনও সমুদয় ব্যাখ্যা জ্ঞাত নাই জালাল মিঞার। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৫৪)

৬.

ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন পরিচর্যা ও প্রকরণের। শামসুদদীন আবুল কালাম ফ্ল্যাশ-ব্যাক, স্মৃতিচারণা, মিথের ব্যবহার, গালগল্প প্রভৃতির মাধ্যমে উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন ইতিহাসকে। মানব সভ্যতার বিপুল ইতিহাস ঔপন্যাসিককে কতটা প্রভাবিত করেছে তা অনুধাবন করা যায় উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে। আবদুল মাস্টারের স্মৃতিচারণায় সোনারগাঁওয়ের ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা —

> কোন কোন পুকুরের পাড়ের কাছাকাছি চোখে পড়িয়াছে চিত্র-বিচিত্র কাষ্ঠ স্তম্ভ — কোনও মৃত আত্মীয়র সদগতি অনুষ্ঠানের স্মৃতিফলক। কেবলমাত্র নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাতে যেন গত মানুষসমাজের ইতিহাসের অংশ। এখনও কোনও কোনও পুকুরগর্ভ হইতে তাহাদের উঠাইয়া কেবল জ্বালানির প্রয়োজনেই ব্যবহার হয়। কোন এক পুকুরে অনেকগুলি পাথর ও পিতলের মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল কাহাদের মাছ ধরিবার সময়, আর সেই সব বা সেই আগন্তুকদের কোনও উদ্দেশ মিলে নাই। অন্য একস্থানে একটা শূন্য মন্দিরের সম্মুখের চত্বরে কালো পাথরের এক বিশালাকার শিবলিঙ্গ আঘাতে আঘাতে স্থানে স্থানে ভাঙিয়া পড়িলেও তখনও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মাটির মধ্যে প্রোথিত ছিল বলিয়াই সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। আবদুল মাস্টারের পক্ষে অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় নাই বহু শত বৎসর যাবত সেইখানে নানা ধরনের ক্রিয়া-কর্ম, পূজা-ব্রত, এমনকি হয়তো হত্যাবলিরও অনুষ্ঠান হইত। অনুসারীরা তাহাদের ভগবানের এমনই আকার-প্রকার দিয়াছিল যে পলায়নের কালে তাহাকে আর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ২৬-২৭)

প্রাচীন যুগকে এভাবেই নিয়ে এসেছেন ঔপন্যাসিক। সমাজের অনেক রূপান্তর ঘটে গেলেও পূর্বের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে যায়নি একেবারে। পূর্বপুরুষদের কৃতকাজ এবং সভ্যতার বিবর্তনের ফলেই ঘটেছে পৃথিবীর রূপান্তর —

> আবদুল মাস্টার একদিন বলিয়াছিল, 'নমস' নামের একদল মানুষগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যখানেও ছিল। ব্যবসায়ী বৈদ্য-গোষ্ঠী তবু ঘর-গৃহস্থালি, দালানকোঠা বাড়ি বানাইয়া সেই ঠাঁইকে শ্রীমণ্ডিত একটা স্থায়ী রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, যথেষ্ট উদ্যমও লইয়া ছিল তাহাদের ধ্যান-ধারণার মত সবদিকের সকল ঠাঁই রূপে-ঐশ্বর্যে ভরিয়া তুলিতে। যতদিন তাহারা বজায় ছিল, এই এলাকার রূপ-ঐশ্বর্যের হাট যেন কখনও পুরোপুরি ভাঙে নাই। তাহাদের আশ্রয়েই একে একে গড়িয়া উঠিতেছিল কৃষক — চাষী, মাঝি-মাল্লা, মিস্ত্রী-কর্মকার, কুম্ভকার-ছুতার — কত বিচিত্র পেশার জনপদও। এমনকি জালিয়া-জোলা, চণ্ডাল-নমশূদ্র এবং ঐ লুঙ্গি-গামছা-পাছাপাড় নীল শাড়ি বুননে দক্ষ তাঁতী বৌদ্ধরাও আসিয়া জুটিয়াছিল। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৩১)

চর্যাপদের যুগকেও যেন ধরতে চেয়েছেন লেখক। প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, তাদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচার, বৌদ্ধদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিকথা এসেছে তাদের বহু প্রজন্মান্তরের উত্তরপুরুষ ত্রিদিবের মাধ্যমে —

> ...ধর্ম সে-ও (ত্রিদিব) বড় একটা বুঝিত না, অথবা সেই বিষয়ে কোনও কিছু বলিতে চাহিত না। কিন্তু অনেক লৌকিক বিশ্বাসের মত কোনও ভান-ভড়ংও তাহার ছিল না। কেবল বলিয়াছিল, পুরুষানুক্রমে তাহারা শিক্ষা পাইয়াছে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে সবরকম বিবাদ-বিসম্বাদ হিংসা-দ্বেষ হইতে সন্তর্পণে দূরে থাকিতে বনে-জঙ্গলের মগদের মত। তাহারা নিজেরাও বিশ্বাস করিয়াছে — যত বন্ধন, তত জ্বালা। জীবন—ক্ষণিক, সংসার—মায়া। হয়ত সেই রকম বোধ-বিশ্বাসের ফলেই সমস্ত রকম সমাজ- সামাজিকতা এড়াইয়া এক রকম নির্জন জীবনযাপনে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও পশু-পাখির প্রাণ-হত্যা, মাছ ধরা এমনকি ক্ষেত-ভরা ফসলের চারা গাছগুলি কাটা, ফুল ও ফল ছিন্ন করাও যেন তাহারা পাপ-কর্মের সমতুল্য জ্ঞান করিত। কখনও কোনও শত্রু অথবা দস্যু আসিয়া হানা দিলেও তাহাদের বধ করিবার পরিবর্তে নিজেরাই এক মৌন প্রতিবাদে আত্মাহুতি দিত। তাহাদের সম্প্রদায়গত পেশা-বৃত্তিও ছিল সব সময় হিংসা বা হত্যার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। ত্রিদিব বলিয়াছিল : সত্য মিথ্যা যা-ই হৌক, অন্ততঃ সেভাবেই আমাগো বুঝানো হইছে, বশম্বদ করিয়া রাখন সম্ভব হইছে, আর তার উপর ভিত বানাইয়া কেউর কেউর রাজ্য-সাম্রাজ্য বানানেরও সুযোগ হইছে। আমরা যতক্ষণ পারছি টিকিয়া থাকনের চেষ্টা করছি : যখন পারি নাই আর, আরও গভীরে, পাহাড়ে-পর্বতে কি ঘন বনেজঙ্গলে গিয়া ঠাঁই লইছি। আমরা আক্ষেপ-বিক্ষোভ কিংবা সাধারণ কান্দা-কাটাতেও যেন ভয় পাইছি। তাড়নায় তাড়নায় অত্যাচারের পর অত্যাচারে আমাগো রুখিয়া দাঁড়ানোর কোন সুযোগ-শক্তি হয় নাই। যে রক্ষক হইতে চাইছে, সে-ই আবার ভক্ষক হইয়া সম্মুখে খাড়াইছে; তখন আমাগো সকল বোধ-বিশ্বাসেও চিড় ধরিয়া গেছে; সেই ফাঁকা, সেই ফাটল যেন আর কখনও জোড়া লাগানোর সুযোগ হয় নাই। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৩৫)

এই ইতিহাস যেন সমগ্র বাঙালি জাতিরই ইতিহাস। বাস্তবিক চিরকাল দুর্বলের ওপর সবল অত্যাচার চালানোর চেষ্টা করেছে। শোষণ করে দাবিয়ে রাখতে অগ্রণী হয়েছে সবকালের শোষকরাই —

> এক সময় ব্রাহ্মণরা শুরু করছিলো আমাগো সম্পূর্ণ উৎপাটন করিয়া ফেলতে, ভাঙিয়া-চুরিয়া শেষ করতে, আবার মুসলমানরাও আসিয়া দিলো মড়ার উপর তারগো খাঁড়ার ঘা, তারাও বৌদ্ধ-বর্ণহিন্দুর কোনও পার্থক্য বুঝে নাই। আসল সার ফেলিয়া কেই বা না দূরে সরিয়া আসিয়া সব তালগোল পাকাইয়া ফেলছে। যারা বলে লা-শরীক আল্লার কথা, তারাই আবার কেমন করিয়া বৌদ্ধদের দূর দূর করতে পারে? যারা বলে নর-নারায়ণের কথা, তারাই আবার অতি প্রয়োজনের মানুষকেও অচ্ছ্যুৎজ্ঞানে পোড়াইয়া মারতে পারে? কেন দেখা দেয় নানান রকম ফারাকবাজি, ফেরেববাজি? যে নিজের পড়শীজনেরে ভালোবাসতে জানে না, তার ভুবনকে ভালোবাসার কথার মধ্যেও কেমন যেন একটা বড় ফাঁক আছে বলিয়া মনে হয়। এই সব ফাঁক-ফাঁকির চক্করে পড়িয়া আমাগো দুর্দশারও শেষ হয় নাই। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৩৫)

তাই তাদের একটা বড় অংশ সিংহল এবং আরও নানা দ্বীপে গিয়ে খ্রিষ্টান হচ্ছিল প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এসেছে বিদ্যাচর্চার প্রসঙ্গও —

> বুড়াবুড়িদের মুখে শুনেছি, একসময় এই গোটা বিল এলাকা জুড়িয়া এইখানেও খুবই বড় বৈশাখী-মেলা বসতো। মধ্যখানে আছিলো, খুবই উঁচা একটা বড় বৌদ্ধস্তূপ। ধাপে ধাপে তাকে তাকে তা এমনই উঁচা আছিলো যে অনেক দূর-দূরান্ত হইতে ঐ গাঙ্গেরও দুই দিকের দুই বাঁক হইতে চউখে পড়তো। সকল চূড়ায় চূড়ায় নিশান উড়তো পতপত করিয়া। সেই স্তূপে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ জড়ো হইতো। কেউ কেউ বলে সেই স্তূপের নাম ছিল কাঞ্চনপুরী। ঐখান থেকিয়াই চতুর্দিকের সব গাঁও-গ্রামের শাসন হইতো। আমি তো আর চৌখে দেখি নাই, তবে ঐ বুড়াদের মুখেই শুনছি সোনায়-মোড়া আছিল তার এক এক চূড়া, আর চতুর্দিকে ছোট ছোট চূড়ার মধ্যে রক্ষার জন্য আছিলো হাজার হাজার হাতে-লেখা বই। সে স্তূপে যারা থাকতো তারা প্রত্যেকে একখান করিয়া লেখতো। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৩৬)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম প্রাচীন দাস-ব্যবসায়ের রূপটি দেখাতে চেয়েছেন এভাবে —

> জোর করিয়া খাটুনি আদায় করা, ভাত-কাপড়ের বদলে হউক, কি অন্য কোনও মূল্যে হউক, এই ব্যবস্থাটা যখন আপন সমাজে আর টিকাইতে পারে নাই, তখনি ধরিয়া-বাঁধিয়া নেওয়া শুরু হইতেছিল সেই সব বিজাতীয়দের পৃথিবীর নানান মুল্লুক হইতে। তাদের সেই রকম বাধ্যবাধকতায় বাঁধতে খুব বেশি পরিশ্রম লাগে নাই। সব মুল্লুকের আদিবাসীরাই যে রাক্ষস একথা প্রচার করছে তারাই নিজের স্বার্থে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৯৭)

আবদুল মাস্টারের এই উক্তি ঔপন্যাসিকেরই উপলব্ধি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন রাজাকারের হয়ে ওঠা। অথবা বলা যায় কীভাবে একটি শ্রেণি যুদ্ধকে অবলম্বন করে মানুষ হত্যা, নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা এবং নারী লোলুপতায় মত্ত হয়েছিল তা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে জয়নাল শেখ চরিত্রের মাধ্যমে। মূলত কুটিল ও খলেরাই এগিয়ে এসেছিল হানাদারদের সাহায্যে। জয়নাল নিজের ভ্রাতৃবধূর প্রতি লোলুপ, অন্যের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণকারী এই হীন ব্যক্তি লোভের এবং হিংস্রতার প্রতিমূর্তি। তার দর্শন —

> টাকা আর মাইয়ামানুষ এই ছাড়া সক্কল কিছু ভুয়া। এই দুই জিনিস হাতের মুঠায় রাখতে পারলে জীবনে আর কোনও কিচ্ছুরই অভাব থাকে না। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৮৯)

এই জয়নালই মাঝে ধর্মের ভেক ধারণ করেছে, কিন্তু গ্রামের মানুষ ঠিকই তার কুঅভিসন্ধি ধরে ফেলেছে।

সমকালীন বড় ঘটনার মধ্যে এসেছে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার কথা, রাণী সম্পত্তির লোভে রাজাকে যেখানে হত্যার চেষ্টা করেছিল।

ঔপন্যাসিক 'বিস্তারণা' অংশ থেকেই প্রবেশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনায়। এই পরিচ্ছেদে নৌকাঘাটে রতনের নৌকার যাত্রী শহর ফেরত একটি ছোট পরিবারের মাধ্যমে ইঙ্গিতময় হয়েছে যুদ্ধের সূচনা —

> তাহার মা তখন স্বামীর কানের কাছে ফিসফিস করিতেছিল : 'যা বলছি তা ভাল করিয়া খেয়াল রাখিও। কেউর সঙ্গে কোনও আলোচনা না, রাজধানীতে কি হইতে আছে — বা না-আছে আমরা তার কিচ্ছু জানি না। আমরা মা-এর অসুখের কথা জানিয়া ছুটিয়া চলছি।' (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৩৬)

ধর্মের ভিত্তিতে যে দেশ ভাগ হয়েছিল, স্বপ্নের পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। আসলে বাঙালি চিরকাল আবেগপ্রবণ জাতি, আর নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা পশ্চিমা শাসকদেরকে সুবিধা করে দিয়েছিল শোষণের। বাঙালির পরাধীনতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী তারা নিজেরাই —

> এইসব মুলুকে যে বাইরের দস্যুদল বারংবার আসিয়া হানা দিছে তা কেবল সম্পদ লুটতেই না; এমন দ্বিধায় ভরা, দুর্বলতায় ভরা, নিজেদের মধ্যেই কলহপরায়ণ এমন ঠাঁইও তারা কম পাইছে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৭৬)

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নে বাঙালিদের মধ্যে জাগ্রত আত্মবিশ্লেষণকেও ধরেছেন লেখক। আবদুল মাস্টার, তার বন্ধু হাসান ইমাম, সহকর্মী, সহকর্মীর স্ত্রী, তারেক, খালেদ, জনৈক নেতা যুদ্ধকে সামনে রেখে নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে জাগাতে চেয়েছে। শহর ফেরত মানুষের ঢল, রাতের আঁধারে দেশত্যাগ কাঞ্চনগ্রামের মানুষকে দিশেহারা করেছে। এর মধ্যেই জালাল মিঞার বাস্তববাদিতা প্রশংসার দাবি রাখে। দেশের উত্তুঙ্গ অবস্থায় প্রায় উদ্বাস্তু রূপার পরিবারকে নিরাপত্তা দেবার ব্যবস্থা করতে সে শহরে উকিলের কাছে গিয়েছে। মূলত কদভানু ও কানুর ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার জন্যেই সে রূপাকে কাগজে-কলমে বিয়ে করতে চেয়েছে। জালাল মিয়া শহরে থাকা অবস্থাতেই কাঞ্চনগ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধ। দোসর জয়নাল শেখের সাহায্যে পাকিস্তানি হানাদাররা প্রবেশ করেছে কাঞ্চনগ্রামে, কালুর মা হয়েছে গুলিবিদ্ধ। ইতোমধ্যেই কাঞ্চনগ্রামে আবদুল মাস্টার ও তার সহচরদের প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। পাকবাহিনীর ফিরে যাবার পথে সংগ্রামের অপেক্ষায় থাকা গেরিলাদের দেখিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন ঔপন্যাসিক —

> ...প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল চতুর্দিক; প্রায় সকলেই এইদিক-সেইদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল।
> সমস্ত দেশের সহিত সেই ভূখণ্ডের মানুষগুলির প্রবল প্রতিরোধ তখন মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হইতেছিল। সামরিক বাহিনী তো সড়কের মুখে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল আবারও; তাহাদের পশ্চাতের দিক হইতে কোনও গ্রামের উপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া

পড়িতেছিল সর্বত্র; সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্রমাগত আরও আরও জনতার বজ্র-নির্ঘোষও পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছিল, কখনও-বা যেন সেইদিকেই ধাইয়া আসিতেছিল।
একটা প্রচণ্ড রকমের সংঘর্ষের অপেক্ষায় তখন সকলেই প্রায় ঘামিয়া উঠিতেছিল। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৫৮২-৫৮৩)

৭.

উপন্যাসের চরিত্র ও চরিত্রায়ণ নিয়ে তাত্ত্বিকদের মতামত প্রণিধানযোগ্য —

উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্র ও চরিত্রায়ণ সমার্থক নয়। চরিত্র হচ্ছে উপন্যাসবিধৃত ব্যক্তিসত্তা। ঔপন্যাসিকের সৃজনদক্ষতা তার মধ্যে আরোপ করে ব্যক্তিত্ব — বলা যেতে পারে ব্যক্তির হয়ে ওঠার কার্যকারণ সৃষ্টি করে। আর চরিত্রায়ণ হলো ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ ও শিল্পশৃঙ্খলার নিগূঢ় পদ্ধতি। চরিত্রায়ণের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিভিন্ন লেখকের অথবা অভিন্ন লেখকের প্রতিটি উপন্যাসের শিল্পস্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। এমনকি ঔপন্যাসিকের জীবনসংক্রান্ত বোধ এবং নির্মাণকৌশলের শৃঙ্খলায় অভিন্ন উপন্যাসে ব্যবহৃত হতে পারে চরিত্রায়ণের বিবিধ পদ্ধতি। ঘটনামুখ্য উপন্যাসে চরিত্রের ওপর ঘটনার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জীবনবাস্তবতার শিল্পরূপ হয়ে উঠতে গেলে মানুষ অর্থাৎ চরিত্রকেই প্রাধান্য দিতে হয়। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে জনজীবন-অভিজ্ঞতা, দর্শন ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হয় আধুনিক ঔপন্যাসিককে। ডব্লিউ. জে. হার্ভে-র মতে, Most great novels exist to reveal and explore character. চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন ও অণুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণশীলতাই মহৎ উপন্যাসকে করে তোলে অস্তিত্বময় ও কালাতিক্রমী। উপন্যাসে চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে যে মানবীয় সম্পর্কের রূপায়ণ ঘটে, তার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে অনেক সময়। আবার কোন কোন চরিত্র পাঠককে উদ্বোধিত করে, প্রভাবিত করে এবং স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করে। (রফিকউল্লাহ, ২০১১ : ১৩-১৪)

আখ্যানের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে মূলত সংলাপ, অন্তর্ভাবনা বা সংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠগত আধিপত্য ও পৌনঃপুনিকতা, মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের পার্থক্য তৈরি করে আর সবচেয়ে বেশি পৌনঃপুনিক চরিত্রগুলো আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে।

সংস্থান মূলত স্থান-কাল-ঘটনা ও চরিত্রের স্থিতি বা অবস্থার জ্ঞাপক। আঞ্চলিকতাধর্মী উপন্যাসে সংস্থানের ভূমিকা ব্যাপক। সংস্থানের সঙ্গে আখ্যানের কোনো ভূমিকার পরিচয়ও বদলে যেতে পারে। সংস্থান হল 'নিরীক্ষণ'-এর অন্যতম পরিণাম, আবার কাহিনির মধ্যে বাস্তবতা আনে বলে এটি চরিত্রায়ণের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি। চরিত্রায়ণের আরেকটি মূল উপাদান হল সংলাপ। সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্রের বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশের ওপর আলোকপাত সম্ভব।

কাঞ্চনগ্রামে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে শামসুদ্দীন আবুল কালাম আখ্যানের চরিত্রায়ণ পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যবহার করেছেন। পৌনঃপুনিকতার ভিত্তিতে আমরা প্রধান চরিত্র হিসেবে পাই জালাল মিঞা, আবদুল মাস্টার, হেদায়েতউল্লাহ, রূপা, কদভানু, কানু, মকবুল খাদেম প্রভৃতিকে। আর কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আলোচিত হয়েছে জালাল মিঞা ও আবদুল আলী

মাস্টার। জালাল মিঞা ঔপন্যাসিকের মানসপুত্র। মূলত তার বক্তব্যে ঔপন্যাসিকের জীবন ভাবনা ও দেশাত্মবোধ বাঙ্ময়।

জালাল মিঞার জীবন বদলে গেছে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে —

> সেই সংসার-প্রিয় পরিজনও একদিন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে, না হয় ঐ সর্বনাশা নদীর স্রোতের মধ্যেই কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। খোঁড়া পা-টা লইয়া জালাল মিঞা যেন বাঁচিয়া রহিল জীবন কি তাহা বুঝিবার জন্য। সেই হতশ্রী এবং নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে, এক বিপুল বন্যায় ভাসিয়া আসা কদভানুর মা এবং কদভানু আর তাহার ছোট ভাই কানুকে আশ্রয় দিতে গিয়া, এখন নিজের অস্তিত্বের সহিতও জড়াইয়া লইয়াছে। বাস্তবিকই যখন কদভানুর মা প্রায় উড়িয়া আসিয়া পড়িয়া ছিল সেই গাঙ্গের ধারে, কদভানু তখনও তাহার কণ্ঠলগ্না, আর কানু গর্ভে। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাদের ঠাঁই-ঠিকানা পাওয়া যায় নাই, তাহাদের আর দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই জালাল মিঞা। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৪৫)

রূপা জালাল মিঞার সংসারেই আত্মনিয়োগ করেছিল নিভৃতে।

শত অবিশ্বাসের মধ্যেও জালাল মিঞার মানসিকতায় এবং অন্যদেরও তার প্রতি ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায় না। জালাল মিঞার ঘর মেরামতের সময় প্রকাশ পেয়েছে গ্রামের মানুষগুলোর ভেতরকার সম্প্রীতি। হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে খেটে উপকার করে দিয়েছে জালাল মিঞার। তাই দেখে জালাল মিঞা আশাবাদী হয়েছে মানুষের ব্যাপারে —

> কিছুই শাশ্বত না হউক কিন্তু ইচ্ছা এবং অনুভূতিগুলি এখনও যেন সর্বত্র ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল, একটা উপলক্ষ এবং অবলম্বন পাইলেই জঙ্গলের কোনওখানে হঠাৎ দেখা বন্য ফুলদলের মতই হাসিয়া উঠিতে চাহিবে, কোনও আত্মীয়তার ইচ্ছা ব্যক্ত করিবে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৫০)

এই মানুষটি রূপা ও তার ছেলে-মেয়েকে অসীম মমতায় আপন করে নিয়েছে। এক পর্যায়ে রূপার প্রতি তার হয়তো বা হার্দিক টানও সৃষ্টি হয়েছে —

> ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতেছিল যে বাস্তবিকই তাহার খেয়াল-তবধ নাই, সে কেবল নিজেকে বঞ্চিত রাখে নাই, নিজ অজ্ঞাতসারে অন্যকে বঞ্চিত রাখিবার অন্যায়ও করিয়াছে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ২৩১)

আবদুল মাস্টার আরেকটি প্রধান চরিত্র-সৃষ্টি। শিক্ষিত মানুষের দেশ ও গ্রাম নিয়ে ভাবনা প্রকাশ করেছেন লেখক এই চরিত্রের মাধ্যমে। আর এই চরিত্রটির মানস-গঠনে বিভিন্ন সময় প্রভাব রেখেছে ইন্দ্রলাল রায়, তার স্কুল-শিক্ষক বরকত বখশ, এমনকি ছাত্রী মালকা বানুও। ইন্দ্রলাল রায়, জালাল মিঞা, বন্ধু হাসান ইমাম তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতি চেতনা। রাঢ় বঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ অভিবাসী আবদুল মাস্টারও দেশভাগের নির্মমতাকে জীবন দিয়ে অনুভব করেছে। এসব কিছুই এই চরিত্রটিকে অনেকাংশে ভাববাদী করে তুলেছে। তার এই নিরাসক্তি ও নির্মোহতার কঠিন দেয়ালে মালকা বানুর বারংবার অনুরাগ নিবেদন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আবদুল মাস্টারের ভাববাদিতা ও জীবনভাবনা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গেছে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৭৯)।

শেষে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আবদুল মাস্টারের বুদ্ধিবাদ সাধারণের কাছে অসীম মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে —

> নিজ স্বাধীন দেশের রূপকল্প মনে যাদের মধ্যে গড়িয়া উঠছে, তাদের রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৫৮৩)

রূপা চরিত্র সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যজগতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তার সঠিক কোনো বংশ পরিচয় দেখান নি লেখক। আক্ষরিক অর্থেই ভেসে এসেছে সে জালাল মিঞার জীবনে। তারপর জড়িয়ে গেছে কাঞ্চনগ্রামের জীবনের সঙ্গে, জালাল মিঞার সংসারে। রূপা ও জালাল মিঞার সম্পর্ক বাংলা উপন্যাসের জগতে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কোনো বন্ধনহীন ও আপাত সম্পর্কহীন নর-নারীর বহুকাল একই সংসারে বসবাস খুব একটা সুলভ নয়। আমরা দেখি যে তাদের ক্রমশ একটা টান গড়ে উঠেছে পরস্পরের প্রতি, কিন্তু তা কোনোভাবেই অনৈতিক বা অশালীন নয়। পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তারা সচেতন থেকেছে। মানবিকতার অসামান্য প্রতিভূ জালাল মিঞা সমাজের কুৎসার ভয় না করে অসহায় এই নারীকে দুই সন্তানসহ নিজের সংসারে আশ্রয় দিয়েছে। তার কোনো আত্মীয় খুঁজে না পেয়ে স্থায়ীভাবে গৃহের কর্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। এবং শেষে রূপার মেয়ে কদভানুর বিয়ের সুব্যবস্থার জন্য রূপাকে কাগজে-কলমে বিয়ে করতে মনস্থ করেছে। রূপার দুই ছেলে-মেয়ে, কানু ও কদভানু জালাল মিঞার নিঃসঙ্গ, মরুময় জীবনে যেন ওয়েসিস বা মরুদ্যান হয়ে এসেছে। তারা হাসি-কথা ও ব্যবহারে জালাল মিঞার জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছে।

হেদায়েতউল্লাহ-আয়েশা গ্রামীণ সুখী দাম্পত্যের প্রতীক। একই সঙ্গে নিরীহ-চিরাচরিত বাঙালি যারা বাধা রুটিনে জীবন কাটিয়ে দেয় তেমনি চরিত্র এ দুটো।

মকবুল খাদেম হচ্ছে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় আশাহত মানুষের প্রতীক। মৌলবি হয়ে সে নিজের এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছে, বলাবাহুল্য যে, তার সুখী জীবনের আশা পূর্ণ হয়নি।

জনার্দন কর্মকারের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বয়ন করেছেন ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ। পরিবারের সবার দেশত্যাগের পরও সদা হাস্য-রসময় এই চরিত্রটি দেশভাগের পর একা থেকে গেছে প্রিয় স্বদেশে। জরা-জর্জর জনার্দন যেন ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই প্রতিভূ। নৌকার মাঝির সাহায্যকারী কিশোর রতনের দূতিয়ালিতে গ্রামান্তরের রাঙাদিদির সঙ্গে গড়ে ওঠা ধাঁধাময় সম্পর্কই যেন তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। অসাম্প্রদায়িক জনার্দন মুসলমানদের কোরআন শরীফ রাখার আধার তৈরিতে অত্যন্ত যত্নবান। এদিক থেকে চরিত্রটি অনন্যতার দাবিদার।

মজিদ ও কাদের চৌকিদার পুঁজিবাদী সমাজের বিকৃতির প্রতীক। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে এরা গ্রাম ত্যাগ করে বা গ্রামে ফিরে আসে। তাদের সম্পদও পুঞ্জীভূত হয় শহরকে আশ্রয় করে। গ্রামের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য অনেকাংশে দায়ী করা যায় তাদের স্বার্থচিন্তা ও গ্রামের প্রতি উদাসীনতাকে। অন্যদিকে আফজল মুন্সী শহরবাসী হলেও গ্রাম ও গ্রামবাসীর প্রতি তার মমত্ববোধ প্রশংসনীয়।

হাসান ইমাম চরিত্রটি অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাখ্যাত হলেও তার প্রভাব ও গুরুত্ব ব্যাপক। ভালো চাকরি নিয়ে প্রবাসী হলেও দেশ-সমাজচিন্তায় প্রাগ্রসর এ চরিত্রটি দেশের সংকটে উদ্বিগ্ন হলেও অর্থনৈতিক বাস্তবতাই তাকে দেশে ফিরতে দেয় না।

দবিরুদ্দি অত্যন্ত সরল ও নিরীহ গ্রামবাসীর প্রতীক। বাহ্যিক আড়ম্বরহীন, বেখেয়ালি এই মানুষটিই প্রয়োজনে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। অসহায় পতিতা চম্পাকে মুক্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছে তাকে উদ্ধার করে, চম্পাকে বিয়ে করতে উৎসাহী হয়েছে। চম্পা উপন্যাসে অনন্ত জীবনাসক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে; যে মুক্ত জীবন চায়, বাঁচতে চায় শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। দবিরুদ্দি মুক্তিযুদ্ধেও রেখেছে অনন্যসাধারণ ভূমিকা।

শেরে বাংলা ফজলুল হক উপন্যাসে যেন একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। জালাল মিঞার মানস-গঠনে, আবদুল মাস্টারের চেতনায়, ইন্দ্রলাল রায়ের উক্তিতে তিনি সদা জীবন্ত। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জনহিতৈষিতা উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে।

৮.

নির্দিষ্ট কোনো প্লট বা আখ্যান কাঠামো মেনে লেখায় প্রবৃত্ত হন নি লেখক। সাধারণ জনজীবনের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে সুপ্রাচীন বা অর্বাচীন অতীতের। 'উপক্রমণিকা' অংশে উপন্যাস শুরু হয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু অতীত ঘটনাগুলো এসেছে অনেকাংশেই চরিত্রগুলোর কথোপকথনে বা চরিত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে ঔপন্যাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্মোহ নন।

'ক্রমান্তরা' অংশে কাহিনি বর্ণনে ঔপন্যাসিক সমকাল থেকে ক্রমশ অতীতে প্রবেশ করেছেন চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রৌঢ় জালাল মিঞা জনার্দন কর্মকারের সন্ধানে বেরিয়ে যৌবনের দিনের কথা কল্পনা করে কল্যাণীর ভাবনায় চলে গেছে, সেখান থেকে আবার কৈশোরের স্বরাজের সময়ে বিচরণ করে আবার কল্যাণীর ভাবনায় মগ্ন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমাতঙ্কের দিনের কথা, তারপর মোগল রাজত্বের কথা স্মরণ করে ফিরে গেছে দাস ব্যবসায়ের সময়ে। রূপার কথা ভাবার মধ্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে বর্তমানে, উপস্থিত হয়েছে জনার্দনের আস্তানায়।

আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দুটি সময়পর্বের সমন্বয়। অর্থাৎ কাহিনিকাল ও কথন কাল। *কাঞ্চনগ্রামে*ও ঘটেছে সময়ের এই মেলবন্ধন। উপন্যাসটির কাহিনিকাল বহু বিস্তৃত, প্রাচীন বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কাল থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। আর কথনকাল হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কিছুদিন থেকে যুদ্ধের শুরুর দিকে কিছু সময়। আর একটি দিক লক্ষণীয় যে, কাহিনিকাল যেমন অতীত কাল তেমনি কথন ভঙ্গিও অতীতকালের। ঔপন্যাসিক উপন্যাস শেষ করেছেন এভাবে—

> তারেককে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাহার হাতে মৃদু চাপড় দিয়া সে আবারও হানাদার ফৌজি বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হইয়াছিল। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৫৮৩)

অর্থাৎ, লেখক যেন বর্তমানে থেকে অতীতের ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন।

লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রধানত উপন্যাসটি বিন্যস্ত —

> খুবই অল্প বয়স তখন জালাল মিঞার, সেই সময় 'স্বরাজ', 'স্বাধীনতা', 'বন্দে মাতরম', 'পাকিস্তান' প্রভৃতি শব্দগুলি সরস্বতী পূজারকালে নানাবর্ণের ঘুড়ি উড়াইবার উৎসবকেও যেন মাত করিয়া দিতে চাহিতেছিল। ঘুড়ি উড়াইবার সঙ্গে সরস্বতী পূজার যে কী সম্পর্ক তা সে কোনওদিন জানে নাই। একটু দূরে, গ্রামের একধারে যে বড়সড় স্কুলটা ছিল এক সময় তার দুই ছাত্র পুরাতন বই-পত্র ছিঁড়িয়া-ফাড়িয়া গঁদের আটায় জুড়িয়া ঢাউশ-ঢাউশ ঘুড়ি তৈরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। দূর হইতে সে দেখিত বটে কেমন করিয়া তৈরি করে ঘুড়ি-লাটাই, মাঞ্জা দেয় কাচের-গুঁড়া-মাখা-ময়দা দিয়া সুতায়। আর কোনও কারণ থাউক বা না-থাউক, না থাকিলেও কোনও কিছু একটা খাড়া করিয়া 'বক কাটা' করার যুদ্ধ ঘোষণা ছড়াইয়া পড়িত, এই পাড়া হইতে সেই পাড়ায়। জালাল মিঞা কখনও কাহাকেও বলে নাই কেমন করিয়া একটা সুন্দর 'বক কাটা' ঘুড়ির পিছনে দৌড়াইতে গিয়া সে পায়ের গিঁট মচকাইয়া ফেলিয়াছিল। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ২১০)

আবার চরিত্রের অন্তর্জগৎ উন্মোচনে লেখক কৌশলী। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ হলেও মনে হয় যেন চরিত্রই আত্মবিশ্লেষণ করছে —

> ...ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতেছিল যে বাস্তবিকই তাহার খেয়াল-তবধ নাই, সে কেবল নিজেকে বঞ্চিত রাখে নাই, নিজ অজ্ঞাতসারে অন্যকে বঞ্চিত রাখিবার অন্যায়ও করিয়াছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ২৩১)

চেতনাপ্রবাহরীতি বা Stream of consciousness উপন্যাসটিতে বহুধাবিস্তৃত। জালাল মিঞা, আবদুল মাস্টার, জনার্দন কর্মকার — এদের চেতনায় বারংবার এসেছে নানা ঘটনা। আবদুল মাস্টারকে বার বার আন্দোলিত করেছে নানা ভাবনা। বর্তমানের সংকটময় অবস্থায় সে নিমজ্জিত হয়েছে অন্যত্র —

> কোনও উদ্যম কোনও প্রচেষ্টাই কি আর মানুষকে আরও মহীয়ান করিয়া তুলিতে পারিবে না? ইন্দ্রলাল রায় যাহাকে বলিতেন ব্রহ্মজ্ঞান, স্বয়ং তাহার পিতা যাহাকে বলিতেন ঈশকে-আল্লাহ্ অথবা অন্তরঙ্গভাবে ভগবৎ-প্রেম কি জীবপ্রেম, তা কি কেবলই কোনও ভাব-তন্ময়তা না দিব্য-দর্শন? 'তোমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে ক্রমাগত তাঁহার বিশালতার মধ্যে লইয়া যাও' — ধর্মপ্রাণ পিতার প্রতিটি কথাকে কখনও কখনও মনে হইত কোনও পবিত্র শ্রুতির পৌনঃপুনিক আবৃত্তি, অনেক জ্ঞান অনেক অভিজ্ঞতা আর প্রগাঢ় আস্থার সারাৎসার। আবদুল মাস্টার আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহাদের প্রতিটি উক্তিকে মিলাইয়া দেখিতে চাহিতেছিল। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৭৫)

এসেছে মিথের প্রসঙ্গ —

> সেই দেবী অন্নপূর্ণাকে তাহারা সমস্ত পৃথিবীর কন্যা, স্বয়ং ভগবান শিবের সহধর্মিণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিল। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ৩৩)

হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার চিরায়িত লোক-বিশ্বাস এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখক সমাজ পরিবর্তনের কারণ প্রকাশ করেছেন তাঁরই মানসপুত্র জালাল মিঞার মুখ দিয়ে —

> ...সব ঠাঁই সব বস্তুই জীবন হইতে জাগিয়া আবারও একদিন জীবনেরই প্রয়োজনে অন্যরূপে অন্যবস্তুতে পরিণত হয়, কেবল নাম-ধাম, বেশ-বাস, পেশা-নেশা, গাঁ-গ্রাম, ভোল-ভাল সব কিছু বদলাইবার আগ্রহটা হয়ত প্রকৃতির মধ্য হইতেই উপ্ত হওয়া কি শিক্ষা নেওয়া অতি সহজ কোনও প্রবৃত্তি, কাহারো খেয়াল থাকুক বা না থাকুক, সকলেই সবকিছুই একটা অমোঘ নিমিত্ত মাত্র। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৪৫-৪৬)

৯.

*কাঞ্চনগ্রাম*টি বাংলাদেশের ঠিক কোথায় অবস্থিত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে জোয়ারে লোনা জল আসা থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি এর অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নদীর বর্ণনা ও ভাষা-ভঙ্গি থেকে মনে হয় এটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কোনো গ্রাম —

> কোথায় হইতে আসতে আছেন? (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৩৪)
> এমন জিনিশ আছে যা বৈদেশ যাইতে আছে না? (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ৫৭)
> বাস্তবিকই একটু উদ্বেগের মধ্যে আছি। এমন কক্ষনও চাই না, তবু দেখতে আছি যেন নিজের গরজের বিষয়টাই মুখ্য হইয়া পড়তে আছে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ২৫৯)

লেখায় লেখক এনেছেন লোকখাবারের বর্ণনা —

> আমন চাউলের ভাত, মাগুর মাছ-কাঁচা কলার তরকারী, ঢেঁড়স-করলা ভাজি, সর্ষেবাটা মিশাইয়া দুই তিন রকম ভর্তা, বড়া, ডাল, কাগজীলেবু, কাঁচা-লঙ্কা। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৩০)
> কোরা নারিকেল শাঁস আর কড়া পোড়া-মরিচ মাখিয়া পান্তাভাত। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৫৫)

আবহমান বাংলার স্বাস্থ্য-চর্চা আবদুল মাস্টারের মনে সদাজাগ্রত —

> ...সেই 'সরভাজা' যেমন তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিয়াছে, এখন ততোধিক তৃপ্তির সঙ্গে সর্বাঙ্গে মাটি মাখিয়া লইতে, মাটি দিয়া দাঁতমুখ পরিষ্কার করিতে, এমন কি শুভ্র-ধবল পলিকণা আহার করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালনেও সে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৫৬)

চিরকালীন বাংলার স্বতঃউদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালির বর্ণনাও উপস্থাপিত *কাঞ্চনগ্রামে*। কাটা-ছেঁড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা, বিভিন্ন লতা-পাতার ভেষজ গুণ উল্লেখযোগ্য —

> একটু ছড়িয়া গেছে মাত্র। পাড়ে উঠিয়া কচুর ডাঁটার রস দিয়া দিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৩৬)
> এই যে দেখো গিমা কি ঢেঁকি-শাক এমন আদনা জিনিশ, এর জন্যও এক একদিন কোন দূর হইতে কবিরাজ মশায় আসিয়া হাজির হইতেন প্রাতঃকালে। (শামসুদ্দীন, ২০০০ : ১৩৬)

কাঞ্চনগ্রামের ঘরের বৈশিষ্ট্যও ব্যতিক্রমি। উক্ত অঞ্চলের ঘর তৈরি-প্রণালি ব্যক্ত করেছেন লেখক, নসুর দৃষ্টিকোণ থেকে —

> নসুর মনে যেমন ধারণা থাকুক, নিজের ঘর-বাড়ি প্রসঙ্গে তাহার কেবলই মনে পড়ে, হয় জালাল মিঞার বাড়ির অথবা তাহার নানার বাড়ির কথা যার আর এখন কোনও চিহ্ন-মাত্র নাই। নানার বাড়ি ছিল অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া, কেবল ঘরের মোটামোটা লোহাকাঠের খুঁটিই না, আশেপাশের সব গাছ-গাছালিও যেন তার অঙ্গ, কেউ ছত্রপতির মত, কেউ সিংহ-দরজার মত, কেউ সারি-বাঁধা পুরঃজন অথবা ভৃত্য-সেবকের মত অভ্যর্থনায় বিস্তৃত মূল বাড়ির উঠান পর্যন্ত নতমস্তকে সারি-বাঁধা; বাড়িয়ালের চতুর্দিকেও বেড়ের উপরকার আইলে সারি সারি তাল-হিন্তাল-তমাল সশস্ত্র লাঠিয়ালদের মত খাড়া। সেই বাড়ির চাল চৌচালা টিনের, কিন্তু ভিত তিন থাকের মাটির, যে মাটিও বিশেষভাবে বাছাই, তাহা থাকে থাকে সাজাইবার ক্রিয়া-কর্মও ছিল জটিল, যাহাতে বন্যার জল, সিঁধকাটা চোর কিংবা অন্য জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হইতেও ঘরের খাটাল সব সময় মুক্ত থাকে। দেয়ালগুলিও পরিষ্কার এঁটেল কাদা-মাটি এবং ছেঁচা মুলি-বাঁশের; পুরু আর শক্ত, লোহা-কাঠের মূল খুঁটির অন্তর অন্তর উপরের আড়-ভরের সঙ্গে নিপুণভাবে বাঁধা। প্রত্যেক খুঁটির গোড়ায় গোড়ায় আলকাতরা এবং অন্য অন্য কাঠের কড়ি-বরগাতেও পোকার বিশেষ করিয়া সর্বনাশা ঘুণের পোকার আক্রমণ এড়াইবার জন্য কত রকম প্রলেপ। সেই সব কাঠও বহুকাল যাবৎ পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া না রাখিয়া ঘরের কাজে লাগান হইত না। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৪২-৪৩)

ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদ—

> খচ্চরের জোয়ালে মুলা ঝুলাইয়া রাখনের লাহান। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৩৮)
> যেই সংসারে পোলাপান কি গুঁড়াগাড়া নাই, সেই সংসার ঝিম ধরিয়া থাকা দুপুরের লাহান। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৫৩)

উপন্যাসটির সময়কাল ব্রিটিশ আমলের কিছু পরের, তাই হয়ত গ্রামবাসী মানুষগুলোর মুখের ভাষায় অনেক ইংরেজি শব্দ অনায়াসে ব্যবহৃত। এই দিক থেকে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বাস্তববাদিতা প্রশংসার দাবিদার নিঃসন্দেহে।

মাটি ব্যবসায়ী নসুর উক্তিতে —

> অনেক স্টাডি করতে হইছে আমারে, এই কামটা ঠিক ঠিক আমলে আনতে, এখন অন্য অন্যদের সঙ্গে কমপিটিশনের কথাও তো খেয়াল রাখতে হয়। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৩৮)

হাসান ইমামের সংলাপে ইংরেজি আরো বেশি —

> এমনও তো হতে পারে যে, তা গভীরভাবে ভালো লাগে বলেই লোকে কেবল তার থ্রিল নোতুন করে পেতে চায়, সব জেনারেশনই ঐ নাটকের মধ্যে উপস্থিত হতে চায়। ইল্যুশনের রিয়ালিটিকে তারা সর্বক্ষণের সর্বকালের বাস্তবের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে। (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৬২)

১০.

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় স্পষ্ট ব্যতিক্রম *কাঞ্চনগ্রাম*; কাহিনিবিন্যাস, সময়-সমন্বয় বা প্রকরণগত দিক থেকে তো বটেই। ঔপন্যাসিক বিপুল সময়-পরিসরকে ধরেছেন উপন্যাসের কলেবরে, এসেছে ব্যাপক মানুষ ও সমাজব্যবস্থার কথা। অতীতকে তিনি নিয়ে এসেছেন নানা অনুষঙ্গসহ, নানা প্রকরণে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লেখকের অসামান্য শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন এ উপন্যাস। অনন্ত পরিশ্রম, পঠন-পাঠন, ইতিহাস চেতনা এই বিস্তৃত আয়তনের উপন্যাসটিকে মহাকাব্যিক করে তুলেছে। আবার আখ্যানের বিভিন্ন নিয়মের ব্যবহার দেখা যায় *কাঞ্চনগ্রামে*, যা উপন্যাসটিকে একটি আখ্যানের মর্যাদা দিয়েছে। দেশ-সমাজ-গ্রামের ক্রমবিবর্তনকে অসামান্য শিল্পদক্ষতায় রূপায়ণের পাশাপাশি আবহমান গ্রামবাংলাকেও ধরেছেন লেখক। এই ভূখণ্ডের রাজনীতি-ইতিহাস-রাজনৈতিক ইতিহাস নির্মোহ ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আর সুদূর ও নিকট অতীতের জীবনবেদ উপস্থাপনার গুণেই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য আখ্যান।

তথ্যসূত্র

১. ইন্দ্রলাল রায়ের উক্তি : "তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) আশি বছর বয়সের সময় সভ্যতার সংকট নামে একটা অভিভাষণ শুনিয়াছিলাম। সে এখন হইতে মাত্র ত্রিশ বছর আগের কথা" (শামসুদ্‌দীন, ২০০০ : ১৮৪)।

গ্রন্থপঞ্জি

অমিতাভ দাস, ২০১০। *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, কলকাতা।

আবদুল মতিন, ১৯৯৮। *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী*, প্রথম সংস্করণ, র‍্যাডিকাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা।

দেবেশ রায়, ১৯৯১। *উপন্যাস নিয়ে*, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০১০। *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান, ২০১১। *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*, প্রথম প্রকাশ, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, ২০০০। *কাঞ্চনগ্রাম*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০১০। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।